শেষ সূত্র

বাণী দত্ত

আজ মালগুলো নিয়ে বেশ কষ্টই হচ্ছিলো তন্ময়ের। অনেক গুলো মাল নিয়ে ব্যাগগুলো বেশ ভারী ছিলো। ভাগ্যিস ছেলেটা স াইকেল নিয়ে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিলো। সকালের নরম সূর্যের আলোয় বাপ ব্যাটা মিলে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললো গ্রামের দিকে। লাল মাটির রাস্তা। বর্ষার সময়টুকু ছাড়া সব সময়েই পায়ে পায়ে লাল ধুলো। রঘুনাথপুর শালতোড়া রোড থেকে দেড় কিলোমিটারের বেশি হাঁটলে তবে তাদের গ্রাম মধুতটী। নামের বাহার আছে! ডাক নাম মৌতোর। মৌতোর নামে পুলিয়ার এই অঞ্চলে আরও একটি গ্রাম আছে। যেটা অনেকটা দূরে। ছেলেটা বক্‌বক্‌ করতে করতে চলেছে। কাল সে সারাদিন কত কী বিক্রি করেছে সেই ফিরিস্তি দিতে দিতে চলেছে। কালে কালে সে যে বাবার থেকেও ভাল ব্যবসাদার হবে এই মর্মে মা যে তাকে লম্বা চওড়া মৌখিক সার্টিফিকেট দিয়েছে, একথাটাও বাবাকে জানাতে ভুললো না।

তন্ময় বড় বড় চটের ব্যাগগুলো সমেত সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে মৃদু হাসল। সস্নেহে ছেলের দিকে তাকাল। কাল থেকে অভিষেক ব াবাকে দেখেনি, তাই মুখে কথার খই ফুটছে। দু'ধারে উঁচু নিচু পাথুরে প্রান্তর। গ্রামের অংশটুকু ছাড়া দিগন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে শ্য ামলিমার লেশ মাত্র নাই। আছে শুধু কিছু ফণীমনসা আর অন্যান্য ক্যাক্টাস। কিছু শুকনো গুল্ম। ডান দিকে দেখা যায় বেরো পাহ াড়। বেরো গ্রামের নামেই পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশেই বেরো গ্রামটি। শুশুনিয়া বা জয়চন্ডীর মত ট্রেকার প্রিয় নয়; তবে এ দিগরে নাম আছে।

ঘুম হয়নি বলে চোখটা জ্বালা জ্বালা করছে। তবে সবটাই কি ঘুম না হওয়ার জ্বালা? মনের জ্বালা বা প্রাণের যন্ত্রণাও কিছু আছে না কি? ছেলেটা বাবাকে পেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। ওকে কিছু বাদেই এই পথ দিয়েই সাইকেলে আসতে হবে। বেরো স্কুলে পড়ে। আচারিয়াদের গ্রাম বলে বিখ্যাত।এবারের এম পি বাসুদেব আচারিয়া এই বংশের লোক।কবে কোন আদ্যিকালে মাদ্রাজ থেকে এই বংশের কেউ এখানে এসেছিলেন শোনা যায়। তখন থেকেই আচারিয়ারা এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়। এখন এঁরা পুরোপুরি বাঙা লি। এই বংশ থেকে বহু লোকজন বিবিধ কাজে ভারতবর্ষের ও বাইরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তন্ময় ও বেরো স্কুলের ছাত্র ছিল। ওদের ব্যাচে ও-ই ছিল ফার্স্ট বয়। সেই সুবাদেই অনেক আশা নিয়ে সে পড়তে গিয়েছিল কলকাতায়। ভর্তি হয়েছিল বঙ্গবাসী কলেজে। তার স্কুলের সেকেন্ড বয় ছিল আচারিয়া বংশের ছেলে। সে আজ বিরাট সরকারী চাকুরে। তন্ময় জানে সে পূজারি বামুনের ছেলে। তার না আছে কোন বংশমর্যাদা, না আছে কোন যোগাযোগ। আচারিয়া বংশের ছেলেরই তো বিরাট সরকারি চাকুরে হওয়াটা স্বাভাবিক। বঙ্গবাসী কলেজে পড়াকালীনই সে বুঝতে পেরেছে যে শুধু বিদ্যায় হবে না, শুধু জ্ঞানে হবে না। উপরে উঠতে গেলে কানেকশন্‌স্‌ চাই; চাই পিছন থেকে ঠেলা মারার যন্ত্র। কিন্তু তখন কলেজ? তখন সে এসব ঘৃণা করত। তখন ত ার মনে অন্য স্বপ্ন; কল্পনায় তখন তার শোষণমুক্ত সমাজ। তখন সে বিপ্লবীর নবজন্মের অঙ্কুর, অচিরে মহীরূহ হওয়ার সাধ। রেডবুক পড়ার মধ্যে সেই শিহরণ, এক নিষিদ্ধ বস্তু আস্বাদনের সেই রোমাঞ্চ! মনে তখন তার অন্য দোলা। নির্মোহ বিপ্লববাদে তখন সে অ াচ্ছন্ন।

"বাবা তুমি কথা বলছ না কেন? তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে? আমি ঠেলব সাইকেলটাকে?" মূর্হূতে যে ধ্যানভঙ্গ হল তন্ময়ের। হেসে বলল না রে। কাল রাত্রে হৈ হট্টগোলে ঘুম হয়নি তো। ট্রেনে তাসটাস খেলেছি।" ছেলে হাসল, 'তাহলে দাও, আমিই নিয়ে য াই সাইকেলটা। তুমি ঘরে ফিরে স্নান করে খেয়ে দেয়ে ঘুমাবে। আমিই আজ দোকান দেখে দেব।"

"না বাবা, তোকে আজ স্কুলে যেতেই হবে। পড়াশুনায় ঢিলে দেওয়া চলবে না। তোমাকে যে অনেক বড়ো হতে হবে।" ছেলে ক্লাশ সিক্স-এ পড়ে। অনেক বড়ো হওয়াটা বাবার কাছে প্রায়ই শোনে। অনুমান করতে পারে না অনেক বড়ো হওয়া মানে কত বড়ো। ত াদের হাইস্কুলের হেডমাস্টারের থেকেও বড়ো? ছেলেকে চুপ করে থাকতে দেখে তন্ময় জিজ্ঞাসা করলো, " কি রে স্কুলে যাবি না?" বিন্দুমাত্র না ভেবে ছেলে উত্তর দিল, "নাই যাব।" বলেই অপরাধীর দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকালো। বাবাও ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। ছেলে মাথা নামিয়ে বললো, 'যাব।'

অনেক চেষ্টা করে তন্ময় পুলিয়ার প্রচলিত ভাষা থেকে ছেলেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছে। সে ও তার স্ত্রী শুদ্ধ বাংলাতেই কথা বলে। অভিষেক সেই পরিবেশেই মানুষ হচ্ছে। কিন্তু গ্রামের অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে প্রচলিত ভাষা রপ্ত হয়ে যায়। অভিজ্ঞতায় তন্ময় দেখেছে যে এর প্রতিফলন অবধারিত ভাবে পরীক্ষার খাতায় ঘটে। একবার এক পরীক্ষায় তারই এক স্কুলের বন্ধু 'সে নেবে না' -- এটা সাধুভাষায় রূপান্তর করেছিল, 'সে লিবেক নাই'।

কথায় কথায় গ্রামে ঢুকে পড়লো ওরা। ঢোকার মুখেই পুরাতন বটতলায় দিব্যি চায়ের মজলিশ। একজন হাঁক পড়লো। "কি তনুদাদা, মাল তো ভালোই আছে মনে লিচ্ছে। দিখাবেক নাই?"

তন্ময় হাসলো "দোকানে আসিস। দেখাবো।" আর একটু হাঁটা পথে গ্রামের বহু পরাতন পাঠশালা। তন্ময় নিজেও এখানে পড়েছিলো। ছেলেও এখানে পড়ছে। অবশেষে বাড়ি এল। বাড়ি এবং মুদির দোকান এক সঙ্গেই। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পাশ করা অনার্স গ্র্যাজুয়েট এখন মুদি দোকানদার। এ নিয়ে তন্ময়ের এখন আর কোন খেদ নেই। বাবা যজমানি করে সংসার চালিয়েছেন। তঁার ছেলে ব্যবসা করে খায়। আবার তার ছেলে কি করবে সেটা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত। দুঃস্বপ্ন হলেও তার সাধ ছেলে ব্যারিস্টার বা বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হোক।

অভিষেকের মা ছেলের চিৎকারে বেরিয়ে এল। মালপত্র নামাতে সাহায্যে করতে গিয়ে স্বামীর চোখমুখ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলো "কি গো, একেবারে ঘুমোও নি? বলেছি যে আর এভাবে যাবার দরকার নেই। আমাদের তো বেশ চলে যাচ্ছে। বেশি মাল আনাতে হলে ডেলিপ্যাসেঞ্জার দিয়ে আনাও।"

তন্ময় সাফাই গাইলো "আরে না না। তেমন কিছু নয়। তুমি কি নতুন কিছু দেখছো না কি? ট্রেনে হট্টগোল। তাসটাসের আড্ডায় কি ঘুম হয়?"

বুকটা চিন চিন করে উঠল। অন্ততঃ অনিমাকে ঠকাতে বা মিথ্যা কথা বলতে ইচছা করে না। সত্যিই কি সে কাল রাত্রে চত্রধরপুর প্যাসেঞ্জারের বাঙ্কটাতে শুধু তাস আর গল্পে মগ্ন ছিলো? না আর কোন চিন্তার কীট তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। অনিমা তার সত্যিকারের জীবনসাথী। যখন জীবনে সে পুরোপুরি বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত, অনিমাই তাকে তলিয়ে যেতে দেয়নি। উৎসাহ দিয়াছে, সাহায্য করেছে, জীবনধারণের কঠোর যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। অথচ এই লড়াই এর সঙ্গী হবে আর কেউ, আর কোন অগ্নিশিখা; এই বোকা ধারণাতেই সে মশগুল ছিলো একদিন। তখন সে বোঝে নি যে জীবনের লড়াইটা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। কাল মিটিং-এ মঞ্জরিকে দেখে সেই পুরাতন ক্ষতটাই চাগিয়ে উঠছিলো বুঝিবা। তন্ময় পরমস্নেহে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো। অনিমা ফিক্ করে হাসলো। অভিষেক বাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার করে বললো। 'মা, আমি একটু পড়ে নিয়েই স্নান করবো। ভাত হয়ে গেলে ঠান্ডা করতে দাও।" অনিমা ত্র্যস্তপদে রান্না ঘরে গেল।

তন্ময় মালগুলো তার দোকান ঘরে গুছিয়ে রাখতে লাগলো। কিছু খদ্দেরও এসে গেছে। দোকান গোছানো ও খদ্দের সামলানো দুটোই চালাতে থাকলো। এটাই তার পৈতৃক বাড়ি। বাড়ি হিসাবে মন্দ নয়। সামনের বড়ো বৈঠকখানা ঘরটায় সে দোকান দিয়েছে। অনার্স গ্র্যাজুয়েট। প্রথমে একটু দ্বিধা ছিল। অনিমার উৎসাহে সব দ্বিধা ছুঁড়ে ফেলে ব্যবসায় মন দিয়েছে। প্রথম প্রথম রঘুনাথপুর থেকে মাল আনতো। ওটাই এ অঞ্চলে বড় গঞ্জ। ছোট টাউন। পাথুরে মাটি। একপাশে জয়চন্ডী পাহাড়। পর্বতারোহণের প্রথম পাঠ নিতে অনেকেই এখানে আসে। এখানে অনেক ঘর মারোয়াড়ি বাস করে। প্রথম প্রথম তাদের কাছ থেকে মাল নিয়ে আসতো। এখন তারাই লোক পাঠিয়ে মাল দিয়ে যায়। মধুতটী এ অঞ্চলে বড় গ্রাম। তাই ত্রমশঃ ব্যবসা সম্প্রসারিত করেছে।কলেজ থাকাকালীন বৈঠকখানা বাজারের দোকানগুলোতে দেখেছে মাল স্টক করে ন্যায্যদামে বিত্রি করলে খদ্দের আসবেই।এই ব্যাপারটা তন্ময় প্রথম থেকেই বজায় রেখেছে। তারই গ্রামবাসীরা তার খদ্দের। তন্ময় তাদেরকে ঠকায় না। এখন অন্যান্য গাম থেকেও অনেকে মাসকাবারি নেয় । মুদির দোকান ত্রমশ বড়ো হয়ে বহু সামগ্রীর দোকান হয়ে দাঁড়াল। প্রথম প্রথম নিজে পয়সা খরচ করে মাসে একবার কলকাতা যেতো। বড় বাজারে মাল কিনতো। এখন বিনা খরচে কলকাতা যাবার আরও সহজ উপায় খুঁজে পেয়েছে। এবং সেটা হচ্ছে মিছিল প্যাসেঞ্জারে উঠে পড়া। চত্রধরপুর প্যাসেঞ্জারের আর এক নাম মিছিল প্যাসেঞ্জার। কী সি পি এম, কী কংগ্রেস, কী ঝাড়খন্ডী, কী এস ইউ সি, --- যে কোন একটা দলে ভিড়ে গেলেই হল। রাতের বেলায় খেয়ে দেয়ে আদ্রা থেকে ট্রেনে ওঠো। হাওড়া স্টেশনে নেমে গ্রুপে দাঁড়াও। ব্যাজ লাগাও। তন্ময়ের কাছে বিভিন্ন পার্টির ব্যাজও জমে গেছে। সামনে ব্যানার নিয়ে ক'জন। পিছনে যূথবদ্ধ সংগ্রামীর দল। সকলকে সচকিত করে উচচারিত হয় প্রতিবাদস্লোগান। বাহিনী চলতে থাকে। কার বাপের ক্ষমতা টিকিট চায়! উদাসীন অন্য দিকে তাকানো কালো কোটবাবুদের ঠেলেঠুলে দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে ব্যারিকেড পার হয় দেশোদ্ধার বাহিনী। মুখে তাদের বিজয়ীর হাসি। তন্ময়ও আজকাল একইভাবে পার হয়। বিভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুদের বা পরিচিত জনকে বলে রেখেছে মিছিলের খবর দেওয়ার জন্য। তারা তাকে নিজেদের লোক বলেই মনে করে এবং ডাকে। তন্ময়ও দলে ভিড়ে যায়। প্রথম প্রথম চিতে বাধতো, বিবেক দংশাতো। ত্রমশঃ সে নিজেকে বুঝিয়েছে এবং মানিয়ে নিয়েছে। দল বেঁধে গেলে যাত্রার নিরাপত্তাটুকুও পায়। কিন্তু সে জানে যে সে যা করছে সেটা ঠিক নয়। তবুও এখনও তো কেউ সন্দেহ করে নি; কিন্তু করবে না কোনদিন, তা তো হতে পারে না। বিবেকের আঘাত এড়াতে সে তার দোকানের জিনিষপত্রের দাম ঐ অঞ্চল বিশেষে কমই নেয়। বোধহয় এটাই তার বিবেকের কাছে ক্ষীণ এক উত্তর।

বড়বাজারে তার বিবিধ ঠেক আছে। সেখানে স্নান করে জলখাবার খেয়ে মালপত্র কিনে বেশির ভাগই ট্রান্সপোর্টে বুক করে দেয়। যতটা পারে নিজের বড় ব্যাগগুলোতে ভরে মহাজনের গদিতেই রেখে দিয়ে আসে। দুপুরে মহাজনের ওখানেই খেয়ে নিয়ে বিকালে

মিটিংএ যায়। অবশ্যই শোনার জন্য নয়, সে মনও তার নেই। যায় কৌতুহলের বশে আর মুখ দেখানোর জন্য। সন্ধ্যায় ফিরে মহাজনের গদিতে স্নান সেরে সেখানে আবার খেয়ে নেয়। তারপর রাত ন'টায় স্টেশনে এসে দলে ঢোকে। সাড়ে ন'টায় ট্রেন দেয়। জায়গা দখলের তাড়া থাকে। সে সবসময়েই সাধারণ বগিতে ওঠে। তবে অনেক বীরবাহুই রিজার্ভড্ কম্পার্টমেন্টের দখলদার হয়ে যায়। গোটা ব্যাপারটায় তার ভীষণ খারাপ লাগে দু'বার, আদ্রাতে এবং হাওড়ায় ট্রেনে ওঠার সময়। যখন দেখে রিজার্ভড্ লেখা কামরায় ক্ষীণদেহী কিন্তু কর্কশকণ্ঠ বীর পুঙ্গবেরা আগে ভাগে জায়গা দখল করে বসে আছে এবং রিজার্ভেশনের সত্যিকারের যাত্রীরা মালপত্র এবং স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন টি-টি-ইর খোঁজে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! অন্য সময় সাধারণ যাত্রীর কাছে সিংহশাবক, কিন্তু সেই সংকট মুহূর্তে সবাই কালো কোট বা খাকি জামা গুটিয়ে জনগণ হয়ে যায়। ট্রেন ছেড়ে যায় আপন খেয়ালে মহানব্রতে লিপ্ত মহামিছিলের মহা মহা টিকিট বিহীন রথীদের নিয়ে। পিছনে পড়ে থাকে অসহায়, ক্রোধান্বিত, অশ্রুসিক্ত রিজার্ভেশনধারী মহামূর্খের দল।

"বাবা, আমি গেলাম,' অভিষেক সাইকেল নিয়ে বেরোবার মুখে বললো," বিকালে এসে তোমার কাছে গল্প শুনবো।"

"এই শুনছো," অনিমা মৃদু স্বরে বললো, " তোমার কাজ হলে স্নান করে নাও।"

"হ্যাঁ, যাই। দুচার জন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মালটা দিয়ে দিই। "

স্নান সেরে তন্ময় খেতে এলো। অন্যদিন সকাল বেলাতেই জল খাবার খেয়ে দোকানে বসে। আজ দেরি হোল। অনিমা খাবার দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলো, "কাল মিটিং কেমন হলো? "

তন্ময় হাসলো। হেসেই বললো, "যেমন হয়। দেশের দুর্দিনে সবাই ব্যাকুল। মানুষের দুঃখমোচনে সব বাবু বিবিরা ঝাঁপিয়ে পড়লো বলে।" তারপর গলা ঝাঁকারি দিয়ে বলল, "বিপ্লব আগত ওই"।

তার ভঙ্গিতে অনিমা হেসে ফেললো। কিন্তু কথার খেই ধরে বললো, "বাবুরা না হয় যে যা বললো। বিবিরা সব দেখতে কেমন? "

আবার বোধহয় বুকে মোচড় দিল একবার। স্ত্রীর উত্তরে খেতে খেতেই উত্তর দিলো "আমার গিন্নির মত নয়।"

কাজে ব্যস্ত অবস্থায় আরত্ত অনিমা উত্তর দিল," মরণ আর কি!"

অনিমা সুশ্রী, সুভাষিণী। মানিয়ে চলার অসীম শক্তি তার। তারই জন্য আজ তন্ময়ের অভাবনীয় সচ্ছল অবস্থা। ফার্স্টক্লাশ অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে সে যখন কলকাতা থেকে চলে আসে, তখন সে ছিল দিগ্‌ভ্রান্ত। ছেলে পাশ করে গ্রামে ফিরেছে এই আনন্দেই আাদিত বাবা পুত্রবধূ আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার পরে তাঁর গৃহ তখন লক্ষ্মীশ্রীহীন। তন্ময়ের মন বোঝার চেষ্টাও করলেন না। হয়তো বা বোঝার প্রয়োজন নেই বলেই! হয়তো বা নিজের ছেলের মনটা বোঝা হয়েই আছে এই ভেবে! সতেরো বছরের অনিমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তন্ময়ের। অনিমার বাপের বাড়ি বাঁকুড়ার শুশুনিয়াতে। সেই সময় অনিমা স্কুলের ছাত্রী। বিয়ের পর একবছর বাপের বাড়িতে রেখে রঘুনাথপুর কলেজে ভর্তি করে বি-এ পাশ করালো। কিছু কিছু টিউশনিই তখন তার সম্বল। এবং এতদিন ধরে শুধু চাকরির সন্ধান করতে লাগলো। সরকারি চাক্‌রির শুধু দরখাস্ত করাই সার। তখন প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি পেতে সেলামি পনেরো হাজার, হাইস্কুলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার। তখন ঊনআশি সালের শেষভাগ। ইংরাজি আশি সালে বাবা মারা গেলেন। অনিমা তখন অনেক পরিণত। সে স্বামীকে বোঝালো অহেতুক কালক্ষেপ করার কোন অর্থ নেই। বাবার মত যজমানি বৃত্তি তন্ময়ের পক্ষে অসম্ভব। অতএব গ্রামের উপযোগী ব্যবসা আরম্ভ কক তন্ময় সামনের বড়ো ঘরটায়। দৃশ্যমান সমাজের কাঠিন্য, নির্মমতা, নির্লিপ্ততা ও অসততায় তন্ময় তখন বিপর্যস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত। তবু স্ত্রীর কথা তার মনে ধরলো। অন্ততঃ এটা বুঝলো যে অর্থকরী কিছু একটা কক সে, এটাই তার স্ত্রী চায়। স্বামীকে চাকুরিজীবী করার কোন কল্পনা বিলাস তার নেই। তারপরেই তার মুদিখানার দোকানের সূত্রপাত। সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলে মুদির দোকান দেবে এটা পরিচিতজনেরা প্রথমে মেনে নিতে না চাইলেও এখন সকলেই তন্ময়ের গুণগ্রাহী। বিশেষ করে একজন শিক্ষিত মানুষ কোন দ্বিধা না করে ব্যবসাতেই মনোনিবেশ করেছে এটা গ্রামে বেশ আলোচ্য বিষয়।

"তনুদা, আছেন নাকি ?" বগলা ডাকলো দোকান ঘর থেকে। তন্ময় দোকানে গেল। বগলা সং সাজে। বিভিন্ন গ্রামে যায় মানুষের মনোরঞ্জন ও কিছু রোজগারের জন্য। সে পুষানুত্রমে বহুরূপী। এ পেশাটা ত্রমশঃ উঠে যাচ্ছে। বগলার সাজ সজ্জার কিছু জিনিষপত্র সে বাগ্‌ড়ি মার্কেট থেকে কিনে আনে। এবারেও অর্ডার ছিল। তন্ময় তার জিনিষপত্র দিয়ে বললো, "কি রে, কাল কি সাজবি?"

"অরণ্যদেব", বগলা বললো, "তবে অরণ্যদেবের মতো বদমাশদের মেরে ঠান্ডা করতে লারব।" বলেই হেসে ফেললো। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে অনিমা একটু ঘুমায়। তন্ময়ও স্ত্রীর সঙ্গে খেয়ে নিয়ে দোকানটাকে আর একটু গুছিয়ে নিয়ে দোতলায় শোবার ঘরে গেল। দোতলায় ঘর দুটি তারই করা। একটু আধুনিক ছোঁয়া আছে। অনিমা নিদ্রিতা। এলো খোঁপা ভেঙে পড়েছে। ভরা যৌবনা জীবনসাথী তার! মুখে চরম প্রশান্তি ও সারল্য। অনিমা ছাড়া, অভিষেক ছাড়া তন্ময় নিজের জীবনটাকে ভাবতেও পারে না। অথচ ব্যাপারটা এককালে তাই কি ছিল? ব্যাপারটা কি তাই ছিল যখন মঞ্জরি তার কলেজ জীবনের প্রতি মুহূর্তের সহচরী ? তখন তার গায়ের রঙ ছিল দুধে আলতা, চেহারায় চটক, চলনে বলনে তুখোড়। কলেজের অন্য ছেলেদের ভাষায় চলমান অগ্নিশিখা'।

কলেজের প্রথম দিনেই এই সুন্দরী মেয়েটি সকলের সঙ্গে আলাপ করে নিলো। ''আমার নাম মঞ্জরী, তোমার নাম কি?'' এটাই ছিল মঞ্জরির সহজ, সোৎসুক প্রশ্ন তন্ময়ের প্রতি। তখন সদ্য গ্রাম থেকে কলকাতায় নূতন আমদানি, একেবারে আনকোরা। সে ভী চোখে দ্বিধাগ্রস্ত উত্তর দিয়েছিল ''তন্ময়।'' বলেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

মঞ্জরি হেসে বলেছিল, '' তুমি চোখ নামিয়ে কথা বলছ কেন?

আমি কি দেখতে খুব বাজে?''

''ন্ না, ত্ তা কেন হবে? '' কোন রকমে চোখ তুলে তন্ময়ের সলজ্জ তোত্লামি। মঞ্জরি বলল, ''তবে চলো। যতগুলোকে পারি যোগ াড় করে ক্যান্টিনে যাওয়া যাক। আমরা সবাই বন্ধু।''

সেই প্রথম। সেই প্রথম আলাপই শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দীর্ঘায়িত হয়েছিল তিন তিনটি বছর ধরে! পুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে স্বপ্নিল মন নিয়ে গেছিলো কলকাতায় পড়তে। কলকাতার চাকচিক্যে তেমন হারিয়ে যায় নি, হারিয়ে গেছিল দুটি টানে; এক মঞ্জরি, দুই আন্দোলন।

''এই তন্ময়, আজ তো সেকেন্ড পিরিয়ডের পরে কোন ক্লাশ নেই। পূরবীতে উত্তমের বই এসেছে। আমাকে নিয়ে যাবে?''

এ আহবান উপেক্ষা করার সাধ্য তন্ময়ের ছিল না। আর এতে সে দোষের ও কিছু দেখেনি। মঞ্জরি ছিলো সকলেরই বন্ধু। কারও সঙ্গে ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে পড়াশুনো আলোচনা করে, কখনও বৈঠকখানা রোডের মোড়ের দোকানটায় সিঙারা আর মিষ্টি খেতে খেতে আড্ডা মারে। আর আজ তাই তাকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যেতে বলতে তন্ময় রাজি হয়ে গেল। নুন শো তে যাবে বলে একটা নাগাদ বেড়িয়ে পড়ল। টিকিটটা একটু আগে কাটাই ভালো। কতটুকুই বা পথ। হলে গিয়ে মঞ্জরি টিকিট কাটলো। এখন বা কি সময়টুকু কাটায় কোথায়? সময় কাটাবার সঙ্গী বাদাম কিনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসলো। সেখানেই তন্ময় জানলো মঞ্জরির বাবা ন াম করা ব্যারিস্টার সি পি এম মনোভাবাপন্ন। রাজনৈতিক উঁচু মহলে যাতায়াত। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবার কাছে অনেক জুনিয়র কাজ করে। মঞ্জরিও জানলে তন্ময়ের একটি দিদি আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন তন্ময়ই বাবা মায়ের শিবরাত্রির সলতে।

এর পর থেকে তন্ময়ই সিনেমা দেখার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে শর্ত এই যে হয় নিজের নিজের পয়সায় সিনেমা দেখবে অথবা তন্ময় সিনেমা দেখাবে। মেয়েরা সিনেমা দেখালে সেটা তার পুষ ইগোতে লাগবে। মঞ্জরি মুচকি হেসে দুটোতেই সায় দিয়েছে।

অবধারিতভাবে মঞ্জরির দিকে আকৃষ্ট হলেও তন্ময় কঠোর পরিশ্রম করতো পড়াশুনোর জন্য। কলেজের অধ্যাপকরাও বুঝে গিয়েছিলেন যে সে অত্যন্ত মেধাবী এবং পড়ুয়া ছেলে। তার বন্ধুরা তাকে যুগপৎ প্রশংসা ও হিংসা করত। ফার্স্ট ইয়ারের শেষদিকে সে আর এক অনুভুতির স্বাদ পেলো। সে উপলব্ধি করলো দেশের জন্য কিছু করা দরকার। এবং সেটা করতে গেলে এই সিস্টেমে বা পটভূমিতে কিছুই হবে না। সব কিছু নূতনভাবে ভাবতে হবে। এস এফ আই বা ছাত্রপরিষদ করে কিছু হবে না। চাই নূতন দিশা, অভ্র ান্ত এক আলোকবর্তিকা। তাই গভীরভাবে ডুবে গেল মার্কস্বাদ লেনিনবাদের গহীনে। রাত জেগে পড়তে লাগলো রাজনৈতিক দর্শন। রেডবুক প্রায় মুখস্থই করে ফেললো। কাকা আর আজিজুল হকের নাম তার রক্তে আগুন ধরায়।

মঞ্জরি বুঝতে পারলো বিপ্লবীর নবোন্মাদনা। সে ফেরাতে চেষ্টা করলো তন্ময়কে। ''তুমি দিনরাত ঐ সব নিয়ে মেতে থাকলে পড় াশুনোর কি হবে? তোমার না স্বপ্ন তুমি চার্টার্ড হবে।''

''সমাজ ও দর্শন নিয়ে চিন্তা করলে কি সি. এ হওয়া যায় না? না মঞ্জরি যাতে জড়িয়েছি নিজের ইচ্ছায়, তা ছাড়তে পারবো না। তেমনিই ছাড়তে পারবো না পড়াশুনা ও আমার এই ক্লাশমেটটিকে।''

মঞ্জরি আর অহেতুক চেষ্টা করেনি। বরং বুঝতে চেষ্টা করেছে তন্ময়ের মনোভাব। বুঝতে চেষ্টা করেছে যে তন্ময় এই মূহূর্তে তাদের ক্ল াসের বেস্ট বয়; সে যখন এদিকে ঝুঁকেছে, তাহলে এর মধ্যে কোন সত্য আছে হয়তো! সাধারণতঃ এই বয়সের শিক্ষিত ছেলেমেয়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাদের পারিবারিক চিন্তাধারা দ্বারাই প্রভাবিত হয়। তবু মঞ্জরির সহযোগিতায় তন্ময় মুগ্ধ হয়েছে। আবিষ্কার করেছে মঞ্জরিকে নূতনভাবে। সিনেমা হল, পার্ক, কফি হাউস, বসন্ত কেবিন, যেখানেই দু'জন গেছে; গভীর আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলন নিয়ে। আলোচনা হয়েছে বিপ্লবের বিভিন্ন রূপরেখা নিয়ে। মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে মঞ্জরি শুনেছে মাও সে তুঙের সেই বাণী, ''নারী, তুমি অর্ধেক আকাশ।'' মঞ্জরিও আলোড়িত হয়েছে, শিহরণ জেগেছে তারও চেতনায়। মঞ্জরিও বুঝতে শিখলো এই সিস্টেমে কিছুই হবে না। অনুভব করতে শিখলো মধ্যপন্থাবলম্বীদের বিশাল ক্লীবত্ব। হৃদয়ঙ্গম করতে শিখল নয়া সংশোধনবাদের বিচিত্র গতিপথ। প্রতি অবসর মুহূর্তে তার চোখে ভেসে উঠত ইয়াংশি নদীতে স্নানরত এক সামাজিক যোদ্ধা, -- যে তার যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল।

অনিমা পাশ ফিরে শুলো। সংসারে নিবেদিত প্রাণ তার এই পরমা নারীর। স্বামী ও পুত্র ছাড়া কিছুই বোঝে না। অনিমার ভাষায় সংসার এক একটা ইউনিট। তার ভগ্নাংশগুলো সব ঠিকঠাক থাকলে তবেই ইউনিটটা ঠিক থাকবে। সাহিত্য অনিমার প্রিয় স াবজেক্ট। তাই তার কথাবার্তার মধ্যে পরিশীলতা বা পরিচ্ছন্নতা তন্ময়কে মুগ্ধ করে। বিয়ের আগে বাবার সনির্বন্ধ আগ্রহে সে মেয়ে

দেখতে গিয়ে অনিমাকে বিবিধ কথাবার্তার মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছিল। "যখন একেবারে একা, তখন কি করতে ভালো লাগে?" সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল, "ভালো বই পড়তে।"

তখনই ভালো লেগেছিল অনিমাকে। বিয়ের পরে সেটা গভীর ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। তন্ময় বোঝে অনিমারা জন্মায় বলেই বহু মানুষ সংসার সমুদ্রে ভেসে থাকতে পারে। গ্রীষ্মের অতি তপ্ত দিনে প্রাণীকূল যখন জীবন্মৃত,অনিমা তখন তার সঙ্গী; বর্ষার ধারা জলে যখন পৃথিবী নিবিড় সজল, কাজল নয়না অনিমা তখন তার সহচরী; শরতের মেঘমুক্ত আকাশে বাতাসে মানুষ যখন পুলকিত, অনিমা তখন তারই সাথে; হেমন্তের সোনার দিনে সংসার যখন উচ্ছ্বসিত, তখনও অনিমা তার অনুগামিনী; শীতের হিমপ্রবাহে জগৎ যখন কম্পমান, অনিমা তখন তার সাহচর্যে; বসন্তের মলয় সন্নিধানে যখন দিক দিগন্ত পুলকিত, অনিমা তখন তারই প্রিয়া। অথচ এরকমটা কি সে ভেবেছিলো? ভেবেছিলো কি মঞ্জরি আর তন্ময় কোনদিন পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারবে? বোটা নিকাল গার্ডেন্সের সুপ্রাচীন সেই বটগাছটার তলায় তারা বলেছিলো যুগ যুগ ধরে একই রকমের সেই কথা গুলিই।

" জানো তন্, তুমি গ্রামের ছেলে। আমি কিন্তু কোনদিন ভাবিনি যে একটা গ্রামের ছেলে আমাকে দিনরাত তারই কথা ভাবাবে।"

" সেটা তোমারই গুণ মন্। আমি তো গেঁয়োই ছিলাম। আমাকে স্মার্ট করে তুলেছো তুমিই।"

" না তন্। তুমি স্মার্ট হয়েছো তোমারই গুণে। তোমার মত মেধাবী ছেলে আমাদের ক্লাশে কি একটিও আছে? আমি শুধু তোমার ফ্যান। শুধু অপেক্ষা করে আছি কবে তুমি ফার্স্টক্লাশ নিয়ে পাশ করে গিয়ে বলতে পারবে যে তুমিই আমার গর্ব। তোমাকে ছাড়া নিজের অস্তিত্ব আজ আমি ভাবতেই পারি না তন্।"

প্রথম যৌবনের আবেগে দুটি প্রাণ, দুটি মন ক্রমশঃ এক প্রাণ এক মন হয়ে পড়েছিল। তারপর একদিন ছুটির অবকাশে তারা বেড়াতে গেল ডায়মন্ড হারবারে। গঙ্গার ধারে এক নিরিবিলি জায়গায় বসেছিলো দুটিতে। সেদিনের সেই স্মৃতিটা ভুলবার চেষ্টাই করে তন্ময়। সেটা যেন কিছুনা। একটা স্বপ্নমাত্র। তবু আনমনে কখনও বা শিহরিত হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ, অনেক ক্ষণ মঞ্জরি চেয়েছিলো তার দিকে। তন্ময় বিব্রত হচ্ছিলো। মঞ্জরি কী কিছু বলতে চায়? কিছু কী দিতে চায়? কিছু পেতে চায়? সদ্য ফোটা যৌবনের সেই চুম্বন, সেই আশ্লেষ, সেই সর্বাঙ্গের বিবশতা, সেই অনাস্বাদিত লিপ্সা আবার পুনর্জন্ম লাভ করলো তার মনে। সে তো ভুলতেই চেয়েছিল। কিন্তু কাল বিকালে মঞ্জরিকে সঙ্গে দেখার পর সেই আশর্ষ্য যন্ত্রনা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

" মা দরজা খোলো" --- দরজায় করাঘাত। অভিষেক ফিরলো। অনিমা ওঠার আগেই তন্ময় গিয়ে দরজা খুললো। অভিষেক সাইকেল সমেত বাড়িতে ঢুকলো। তাদের স্বপ্ন, ভবিষ্যতের মহীরূহের বীজ।

" কি রে, আজ তাড়াতাড়ি ছুটি হল যে?" অনিমা ঘুম জড়ানো চোখে জিজ্ঞাসা করলো।

"শেষের দু' পিরিয়ড হোল না। বিপিনবাবুর মায়ের অসুখ। ক্লাশ হয় নি।"

এই হয়েছে আজকাল। এ জিনিষ ভাবাই যেত না তন্ময়ের স্কুলজীবনে। কোনদিন দেখেনি স্কুলের মাস্টার মশাই ছেলে পড়ানোর মূল কাজটাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রাজনীতি করে বেড়ায়। বিপিনবাবু পাশ কোর্সের গ্র্যাজুয়েট। ছাত্রজীবনে পলিটিক্স করতেন। সেই সূত্রে চাক্‌রিটিও অনায়াস লভ্য হয়। প্রথম মাস ছয়েক ভাব গতিক বুঝে নেন। তারপরেই বুঝে নেন চাক্‌রি করার মূল সুরটি। প্রথমে স্কুলের রাজনীতি, পরে গ্রামের রাজনীতি এবং তারপর জেলা পরিষদের মেম্বার। দোতলা বাড়ি হয়েছে, জমি জিরেত হয়েছে, দু'টি টু-হুইলার হয়েছে। বেশ বিত্তবান ব্যক্তি। এমনিতে মাসে পাঁচ ছয়দিন একটি দুটির বেশি ক্লাশ নেন না। যে দিন ক্লাশ নেওয়ার থাকে, সেদিন যদি আবার পার্টি মিটিং থাকে; তাহলে মায়ের অসুখ হয়। তাই আজ অভিষেক তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে ।

"বাবা তুমি আমাকে কলকাতার গল্প বল" অভিষেক দুধ মুড়ি খেতে খেতে বললো। তন্ময় হাসলো, "গল্প আবার নতুন কী রে? বড় বাজারে মাল কিনলাম। কিছু বুক করে দিলাম। কিছু নিয়ে এসেছি। মাঝখানে একবার মিটিং-এ গেলাম। সেখানে এক কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল।"

" কে গো? ছেলে না মেয়ে?" চা করতে করতে অনিমার প্রশ্ন।

"কেন?" তন্ময় হাসলো, " আমার পত্নী পরায়ণতাতে কোন সন্দেহ আছে?

" কী কথার কী উত্তর", অনিমা ভ্রুভঙ্গি করল, "এমনিই জানতে চাইছিলাম"।

তন্ময় গম্ভীর গলায় বলল, " আমার কলেজের বন্ধু। মেয়ে। নাম মঞ্জরি। বিবাহিতা। "

অনিমা তন্ময়কে চা দিয়ে হেসে বললো, "শেষের অংশটা না বললেও হতো। তোমার ক্লাশের বন্ধু, মানে আমার দিদি। বিবাহিতা নিশ্চয়ই। তোমাকে নিয়ে আমার ঐ সব কোন দুর্ভাবনা নেই। তবে আজ দুপুরে অন্যবারের মত একটুকুও ঘুমোলে না। তাই ভাবছি তোমার হল কী। তোমাকে তো বলেছি আর নিজে যেতে হবে না। সব কিছুই তো ট্রান্সপোর্টে আনাতে পার।"

"মা আমি খেলতে গেলাম। বাবা, সন্ধ্যাবেলায় তোমার কাছে অঙ্ক করবো।" অভিষেক বেড়িয়ে গেল। তন্ময় স্ত্রীর কাছে গেল। তার কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধ স্বরে বললো, " অনিমা, তোমার লক্ষ্য স্থির। এবং সেটা হল সংসারের হাল শক্তভাবে ধরে থাকা। সবাই তো আর পারে না। লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটে"।

অনিমা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "তোমার কি হয়েছে গো? মিটিং-এ কোন ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?
"আরে না, না। কিছুই হয় নি," চায়ের কাপটা অনিমার হাতে দিয়ে তন্ময় হো হো করে হেসে উঠলো।
"তনুদাদা আছেন না কি?" বগলা ডাকলো, " কিছু মাল নেব।"

তন্ময় দোকানে গেল। মালের লিস্ট নিয়ে বলল, " কি বগলা, আজ কোথায় গিয়েছিলে অরণ্যদেব সেজে?"

" সাতুড়ি। রোজগার আজ মন্দ হয় নি দাদা। অরণ্যদেব টেব তো কেউ সাজে না। সবাই সাজে হয় শিব, নয় কৃষ্ণ।"

"বহুরূপী আজ কাল আর দেখা যায় না। আমরা ছোটবেলায় প্রতিটা গাঁ থেকেই বহুরূপী বেরোতে দেখতাম। আমাদের চিগুলো বদলে যাচ্ছে বোধ হয়। তুমি কি বল বগলা?"

"এতো সোজা কথা দাদা", বগলা বললো, " সাজা বহুরূপীর দরকার কী? সব মানুষই তো বহুরূপী।"

" কথাটা ভালোই বলেছো বগলা। আমরা সবাই বহুরূপ ধারণ করতে পারি।"

বগলা চলে গেল। সন্ধ্যাবেলায় আরও কিছু খদ্দের এলো। তাদেরকে বিদায় করতেই অভিষেক ফিরে এল। তন্ময় দোকান বন্ধ করে ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসল। নিজের সন্তানকে সে নিজের মতো করে মানুষ করবে। পৃথিবীর কোটী কোটী বাবার মতো তারও সাধ যে তার অপূর্ণতাকে সে ছেলের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করবে। আচ্ছা, যদি মঞ্জরির সঙ্গে তার বিয়ে হতো, সে কী এই ভাবে স্বপ্ন দেখতে পারতো? সে কী পারতো এই মঞ্জরিকে নিয়ে এই নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করা আর স্বপ্নের জাল বুনে যাওয়া? এ জীবনে উদ্দামতা নেই, উচ্ছ্বলতা নেই; এ জীবনে নেই বহির্বিশ্বের মনোরঞ্জনের উপাদান। আছে শুধু দৈনন্দিন কাল যাপন, আর আছে এক নিশ্ছিদ্র নিশ্চিন্ততা। না, মঞ্জরির সঙ্গে বিয়ে হলে তাকে নিয়ে সুদূর পুলিয়ার এই অখ্যাত গ্রামে সে কোনদিনই থাকতে পারতো না। মঞ্জরিও থাকতে পারতো না। সিনেমা-থিয়েটার-খেলা-মেলা-হোটেল-রেস্তোঁরা-পার্টির জৌলুষ ছেড়ে এই মধুতটীতে মঞ্জরিকে নিয়ে বসবাস! সে তো ভাবাই যায় না।

"বাবা এই অংকটা দেখ না" --- অভিষেক বললো।

তন্ময় বাস্তবে ফিরে এল --- " দে তো, দেখি।" সে অংকে মন দিলো।

"কি গো, আজ তাড়াতাড়ি খাবে তো? খিচুড়ি, আলুভাজা, ডিমভাজা, বেগুনি আর তোমার আনা আমের আচার।"

"ওঃ মা, আমি আগে খাব। আজ কী মজা।"

ছেলের কান্ড দেখে দু'জনেই হেসে ফেললো।

তাই হলো। তাড়াতাড়িই খাওয়া হলো। অনিমার হাতের রান্না অপূর্ব। অভিষেক খেয়ে শুতে গেল। অনিমা গোছগাছ করতে করতে বললো, " তুমি কখন শোবে"?

"তুমি শুয়ে পড়। আমি হিসাবপত্র সেরে এখনি আসছি।"

" সে না হয় আমি যাচ্ছি। কিন্তু তোমার আজ কিছু একটা হয়েছে। তুমি বলছো না। যাই হোক, আমি শুতে গেলাম। তুমি কাজ সেরে এসো।"

তন্ময় হিসাব নিয়ে বসলো। শহরের রাত্রি শু হয় গভীর রাত্রে; গ্রামের রাত্রি শু হয় সন্ধ্যার পরেই। শেয়ালের ডাক, কুকুরের ডাক, পেঁচার ডাক শোনা যায় মাঝে মাঝে। মোটামুটি সাড়ে সাতটা, আটটার মধ্যেই পথঘাট শুনসান। শীতকালে আরও আগে। তার স্কুলজীবনে হায়েনার ডাক শুনেছে বহুবার। একবার বেরোপাহাড় থেকে একটা চিতাবাঘের বাচ্চা পেয়েছিল। অতি যত্নে বাড়িতে নিয়ে এসে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলো। বাচ্চাটা বাঁচে নি। আজ অনেকদিনবাদে কী মনে পড়ায় সিন্দুকের ভিতর থেকে তার হিসাব নিকাশের পুরনো খাতাটা বের করলো। এই সিন্দুকটায় অনিমা হাত দেয় না। খাতার ভিতর গোঁজা ছিলো একটি বিবর্ণ খাম। ভিতর থেকে বের করলো একটি কম্বাইন্ড ছবি। তার আর মঞ্জরির। থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি সময়ে যখন সে মঞ্জরিকে প্রপোজ করেছিল, সেই সময়কার। মঞ্জরি রাজি হয়েছিল আর আবেগমথিত কণ্ঠে বলেছিল, "এদিনটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম তন্। তোমাকে ফার্স্টক্লাশ পেতেই হবে। তারপরই সি-এতে ঢুকে পড়বে। বাবাকে আমি একটু আভাস দিয়েছি।"
তন্ময় হেসে বলেছিলো, " এতটা তো তুলছো আমাকে। তারপর গ্র্যাজুয়েট হয়েই দেখব তুমি আর কারও গৃহিনী হয়েছ।" মঞ্জরি তার মুখে চাপা দিয়ে বলেছিলো, " ও কথা বলো না তন্। তোমাকে ছাড়া আমার আলাদা সত্ত্বা হতেই পারে না। বিশেষ করে অন্য কারোর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মিলবে কি করে? বাবা যদি এগোতে চান, আমি বাধা দেবো।"

আজ মঞ্জরির ফটোকে তন্ময় জিজ্ঞাসা করতে চাইলো " তাহলে কেন মঞ্জরি তুমি একজন অন্য পথের পথিকের স্ত্রী হলে। তোমার না আলাদা সত্ত্বা ছিল! তুমি না ছিলে বিপ্লবী। অথচ খদ্দর আর জহরকোট পরা তোমার স্বামীর সঙ্গে তুমি খদ্দরের শাড়ি পরে তো হাসিমুখেই গাড়ি থেকে নামলে। ভাগ্যিস আমাকে দেখলে এব চিনতেও পারলে! কথা বলে আমাকে ধন্য করে মঞ্চে

উঠলে; বক্তৃতা দিলে।"

চোখের কোনটা অকারণেই বোধ হয় জলে ভরে উঠলো। ফটোটাকে পকেটে নিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে ছাদে গেল তন্ময়। দোতলার ছাদ। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। দক্ষিণে বেরো পাহাড় থেকে দূরভাষী শেয়ালের ডাক শোনা গেল। পশ্চিমে জয়চন্ডী পাহাড়ের চূড়াটা আবছা দেখা যায়। দক্ষিণ পশ্চিমে দিকচক্রবালে একটা আলোর আভা অন্ধকারকে ছিন্ন করছে। ওটা আদ্রা শহরের আলো। তাদের এই বাড়িতে ইলেক্ট্রিসিটি আছে বছর দুই ধরে, গ্রামের রাস্তায় নেই। সেটা ভাবাও যায় না তার বাবার আমলেও পুলিয়া যেমন অবহেলিত ছিল, আজ একবিংশ শতাব্দীর মুখে এসেও প্রায় সে রকমই অবহেলিত আছে। জমিদারি প্রথা উঠে গেছে, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র উঠে গেছে। কিন্তু এসেছে এক নব্য ধনিক শ্রেণী, এসেছে সামন্ততান্ত্রিক বর্বরতার আধুনিক রূপ।

ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে দিন সাতেক মধুতটীতে এসেছিলো তন্ময় বাবার সাথে দেখা করতে। তারপর কলেজে ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর গল্প। নবাগতদের উপদেশ প্রদান। আর ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনা চিন্তা। মঞ্জরিকে আর দেখা যায় না। শেষে ক্লাশের আর একটি মেয়েকে একদিন দেখতে পেয়ে মঞ্জরির কথা জিজ্ঞাসা করলো। তার সহপাঠিনী মুচকি হেসে জানালো মঞ্জরির এখন বাইরে বেরনোর অসুবিধা আছে। তার বাবা বিয়ে ঠিক করেছেন। নাম করা ব্যারিষ্টারের ছেলে। ব্যারিষ্টার সাহেব কংগ্রেসের নেতা। ছেলেও মাস ছয়েক ব্যারিষ্টারি পাশ করে বাবার সঙ্গে কাজ করছে। রেজাল্ট বেরনোর পরই মঞ্জরির বিয়ে।

তন্ময় আহত হোল, কিন্তু বুদ্ধিমান বলে বিস্মিত হোল না। এটাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে তো মঞ্জরির বিয়ে হবার কথা নয়। এটাই তো গপ্পো।

মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে বোঝালো যে সে মঞ্জরিকে ভালবাসে। তাই বাবার নির্দেশিত বিয়েতে সে যদি রাজি থাকে, তবে তাই হোক। শুধু মনে রাখবে যৌবনের কিছু কিছু উদ্দাম মুহূর্তগুলি। কোন এক অলসক্ষণে সে মনে করবে কিছু ব্যাকুলতা, কিছু অর্থহীন সংলাপ।

জ্যোৎস্নালোকে তার আর মঞ্জরির ফটোটিকে আর একবার দেখলো তন্ময়। পুরাতন স্মৃতির রোমন্থনে তার চোখদুটি আর একবার জলে ভরে উঠলো। অনুচচারিত শব্দে কোন এক গভীর স্বননে মঞ্জরিকে বললো তন্ময়, " মঞ্জরি আমি এক গ্রামের ছেলে তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তাতে কোন খাদ ছিল না। আমি সামাজিক ন্যায়ের বাসনায় নকশালপন্থী আন্দোলনকে সমর্থন করতাম। তুমিও আমার অনুগামিনী ছিলে। তুমি আমাকে প্রেমের ললিতবাণী যতই শোনাও, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিলোই। উপন্যাসে যাই লেখা থাক, গরীব পুতের ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না, এটাই বাস্তব। কিন্তু তোমার মানসিকতাকে তুমি বিসর্জন দিলে কী করে? আমার পথ ভুল ছিলো, চিন্তায় ভুল ছিলো না। আমি এখনও সেই চিন্তারই অনুসারী। একটাই যোগসূত্র ছিল তোমার সঙ্গে আমার এই ফটোর মাধ্যমে এই ভেবে যে তোমার চিন্তাধারাটা অটুট থাকবে। আজ দেখলাম তা নেই। আজ থেকে তাই শেষ সূত্রটাও ছিঁড়ে ফেললাম।"

ফটোটাকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে তন্ময় ছাদের ধারে এসে দাঁড়ালো। সে কি অসুখী? সে কি অতৃপ্ত? না একেবারেই না। তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে রয়েছে অনিমা আর অভিষেক। তার মনের সমস্ত ক্ষতস্থান নিরাময় করেছে একটিই নারী। তার নাম অনিমা। অথচ আজ সারাদিন অন্য একটা মেয়ের কথা ভেবেই কাটালো সে।

হঠাৎ পিঠে কার স্পর্শ পেল। অনিমা ছাদে এসেছে। " কী গো, কী হয়েছে তোমার? বলো না?"

উদ্‌গত কান্নায় তন্ময়ের বুকে মোচড় দিয়ে উঠলো। তার জীবনের পরমাকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুম্বনে আপ্লুত করে তাকে বললো,

"তোমাদেরকে ছেড়ে বাইরে যেতে আর ভালো লাগে না। ভাবছি কালই রঘুনাথপুরে গিয়ে করবাবুদের সঙ্গে দেখা করবো। কলকাতা থেকে ওদের ট্রান্সপোর্টেই সব মাল আনাবো।'